বিজন ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনে যাঁহাদের দান সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। অভিনয়, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্য রচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুগভীর সমাজচেতনা এবং নাটকের মাধ্যমে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা প্রসারের প্রচেষ্টাই তাঁহার সব নাটকে লক্ষ্য করা যায়। তিনি খুব বেশী নাটক লেখেন নাই, কিন্তু যখনই লিখিয়াছেন তখনই তাঁহার অকৃত্রিম ও সহানুভূতিপূর্ণ সমাজবোধের প্রেরণা হইতেই লিখিয়াছেন. তাঁহার নাট্যজীবনের সূচনায় 'জবানবন্দী', ও 'নবান্ন' নাটকে যে মননশীল সমাজবাস্তবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে 'গোত্রান্তর' নাটকে পরিবর্তিত সমাজের চিত্রণে সেই সমাজবাস্তবতারই পরিচয় পাইয়াছি।

॥ নবান্ন (১৯৪৪) ॥ ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকটি গণনাট্য আন্দোলনের শুধু প্রবর্তক নহে, এই আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নাটকরূপেও স্বীকৃত। এই নাটকের মধ্য দিয়া নাট্য-আন্দোলন দেশের বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদী গণ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয় এবং ইহার প্রয়োগে সর্বপ্রথম মঞ্চ আঙ্গিকের প্রচলিত সংস্কার বর্জন করিয়া আলোকসম্পাত ও শব্দক্ষেপণের নানা কলাকৌশল অবলম্বনে দৃশ্যপরিবেশ ও ভাবপরিবেশ গঠনের চেষ্টা দেখা গিয়াছে।

নাটকের গঠন, চরিত্র চিত্রণ ও তত্ত্বনিয়ন্ত্রিত বক্তব্যপরিস্ফুটনের দিক দিয়া যে-সব নূতনত্ব দেখা গেল সেগুলি হইল—(১) এই নাটকেই সর্বপ্রথম মূল চরিত্রগুলি সমগ্র কৃষক সমাজ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। (২) চরিত্রগুলি ব্যক্তিরূপ অপেক্ষা শ্রেণীরূপেই

Scanned with CamScanner

উপস্থাপিত হইয়াছে। নাটকের মূল সংঘাত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত না হইয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাত হইয়া উঠিয়াছে। (৩) পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের সমস্যা ও সঙ্কট এ নাটকে গৌণ, আমিনপুরের কৃষকসমাজ এবং ব্যঞ্জনায় দেশের সমগ্র কৃষক সমাজের সমষ্টিগত জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের রূপই নাটকে উদ্‌ঘাটিত। (৪) শিল্পের পরিণাম অপেক্ষা তত্ত্বের প্রয়োজনই এ-নাটকে বড় হইয়া উঠিয়াছে। এ-নাটকের অনিবার্য শৈল্পিক পরিণাম হওয়া উচিত দুঃখে, হাহাকারে কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদে শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষের অভ্যুত্থান ও অন্তিম জয়েই নাটকের শেষ দেখাইতে হইবে। শিল্পের আবেদন অপেক্ষা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারই হইল মূল কথা।

'নবান্ন' নাটকের প্রয়োগে যে সব অভিনব রীতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হইয়াছিল সেগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) নবান্ন সাত দিন শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সীমায়িত মঞ্চের স্বল্প স্থান এই নাটকের উপযোগী নহে। এ-নাটকের ক্রিয়া বহু মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নবান্ন-উৎসবের জন্য বহুবিস্তৃত স্থানের প্রয়োজন। সেজন্য এ-নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটিয়াছে প্রসারিত অভিনয়-অঙ্গনে বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে। (২) বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যপট, মায়াজাল সৃষ্টিকারী অঙ্গসজ্জা ও সাজপোষাক এতদিন থিয়েটারে শোভা পাইত, সেখানে এই প্রথম আসিল বুভুক্ষু মানুষের মিছিল, ছিন্নবাস, নগ্নগাত্র ভিক্ষুকের কুৎসিত কদর্য চেহারা, খাদ্যের জন্য মানুষের বীভৎস পশুবৃত্তি। শিল্পের[১] সৌন্দর্য, আনন্দ, রস মঞ্চ হইতে অন্তর্হিত, সেখানে অসুন্দর বীভৎসতার চীৎকৃত আর্তনাদ। (৩) সুঅঙ্কিত, সুদৃশ্য দৃশ্যপটের ব্যবহার না করিয়া অত্যন্ত সাধারণ ও সস্তা ধরনের বস্তু দিয়া পশ্চাৎপট নির্মাণ করিয়া তাহার ব্যবহার এই মঞ্চে প্রথম দেখা গেল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নির্দেশেই মঞ্চটাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন পিস চটের পর্দায় পশ্চাৎপট তৈরী হইল। একই দৃশ্যপটের সম্মুখে সমগ্র নাট্যক্রিয়া ঘটিয়াছিল। (৪) 'নবান্ন' নাটকে দৃশ্যসজ্জার জাঁকজমক না থাকিলেও আলো ও শব্দপ্রয়োগে নানা নূতন কলাকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছিল। আলো যে শুধু আলোকিত করে না, তাহা যে সমস্ত নাট্যক্রিয়াকে ব্যাপ্ত, উজ্জীবিত ও বেগবান করিয়া তোলে এ-নাটকে তাহাই প্রথম দেখা গেল। প্রথম দৃশ্যে মঞ্চে জ্বলন্ত মশাল ঘুরাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিগন্ত লাল হইয়া ওঠার মধ্যে যেন সংগ্রামের আগুনের সর্বত্রব্যাপ্তির ব্যঞ্জনাই ফুটিয়া উঠিত। প্রথম দৃশ্যে ধুম্রকুণ্ডলী, ছাই, আগুনের ফুলকি এবং ছায়ামূর্তি সব নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। পর্দায় আলো ফেলিয়া Shadow Play অথবা ছায়াভিনয়ে গোরুদৌড় দেখাইবার দৃশ্যটির মধ্যেও আলোক সম্পাতের অভিনব কলাকৌশল সর্বপ্রথম দেখান হইল। পরবর্তীকালে এই ধরনের আলোর চাতুর্য বহুক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। (৫) আলোর মত শব্দপ্রয়োগেও এ-নাটকে কয়েকটি অভিনব কলাকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছিল। 'নবান্ন' নাটকেই সম্ভবত সর্বপ্রথম মাইক ব্যবহার করা হইয়াছিল। বিপুল দর্শক সমাবেশের শেষ প্রান্তে কথা পৌঁছাইবার জন্য এবং নাটকের বক্তব্য জোরালো ভাবে প্রচার করিবার জন্যই মাইকের ব্যবহার করা

১। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী এ-নাটকের অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ-সব নাটক তোমরা দু'এক দিন করলে, লোকে দেখলো—কিন্তু আমরা করলে লোক আসবে না, বলবে ওটা ভিখিরীদের থিয়েটার।'

নবান্নের স্মৃতি—নাটক ও নাট্যআন্দোলন—গঙ্গাপদ বসু পৃঃ ১৬

Scanned with CamScanner

হইয়াছিল। প্রথম দৃশ্যে গুলির শব্দ, গণ্ডগোল, জনতার ও-ও-ও শব্দ করিয়া অগ্রসর হওয়া এবং ই-ই শব্দে পিছাইয়া পড়া ইত্যাদি বহু ধরনের শব্দপ্রয়োগে নাট্যক্রিয়া উত্তেজনাজনক ও তীব্র বেগসম্পন্ন হইয়াছে। বন্যার দৃশ্যে সোঁ সোঁ বানের ডাক, বাতাসের দমকা ঝাপটা, মড় মড় মড়াৎ গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ, ঝড়ের তাণ্ডব সাই-সোঁ-সন এবং নেপথ্যবর্তী আর্ত চীৎকার ইত্যাদির মধ্য দিয়া বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজধানীর রাস্তায় দৃশ্যের পর দৃশ্যে 'ফ্যান দাও-ফ্যান দাও' এই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আর্তনাদ মন্বন্তরের বাস্তব দৃশ্যটি একটি করুণ কাতর ক্রন্দনের মত সকলকে আকুল করিয়া তুলিত। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নবান্ন উৎসব আলো ও শব্দের সহযোগে ফুটিয়া উঠিত। গোরুর দৌড়ের সঙ্গে গোরুর ডাক, ঘণ্টার শব্দ, ঢোলের শব্দ, গোরুর খুরের শব্দ, হুড় হুড় দুড় দুড় আওয়াজ, গুরু গুরু মেঘের গর্জন ইত্যাদি কত প্রকার শব্দ যে করা হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। সংলাপের মত আলো ও শব্দ যে নাট্যক্রিয়াকে ভাবময় ও অর্থময় করিয়া তোলে তাহার নিদর্শন 'নবান্ন' নাটকে দেখা গেল। (৬) নবান্ন নাটকেই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত অভিনয় শ্রেণীগত অভিনয়ে পরিণত হইল। বিপরীত ভাব ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে, কামনার সঙ্গে বিবেকের দ্বন্দ্বে, এক ইচ্ছার সঙ্গে অপর ইচ্ছার দ্বন্দ্বে ব্যক্তিচরিত্রের যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, দেহভঙ্গি ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া 'নবান্ন' নাটকে তাহার কোন সুযোগ নাই। এই নাটকের চরিত্রগুলির নিজস্ব কোন আবর্ত নাই, ইহারা সকলেই এক সূত্রে গাঁথা, তাহাদের ভাবনা এক, উদ্দেশ্যও এক। সেজন্য তাহারা সকলেই একই সুরে বাঁধা তন্ত্রীর মত ঝঙ্কার দিয়াছে। তাহারা স্পষ্ট, পূর্ণভাবে ব্যক্ত, একই বেদনায় কাতর, একই সঙ্কল্পে সোচ্চার। বহুসংখ্যক মানুষকে সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্য দিয়া একই স্তরে আনিয়া একটি সম্মিলিত দাবী ও প্রতিবাদে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই হইল এখানে অভিনয়-পরিচালকের উদ্দেশ্য।[১]

'নবান্ন' নাটকের কাহিনীর পটভূমি নিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। পঞ্চাশের মন্বন্তর অবলম্বনেই নাটকের কাহিনী রচিত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের বিভীষিকা বাংলাদেশকে গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহার এক বৎসর আগে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ বিপ্লব সমস্ত দেশকে উত্তাল করিয়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যে বিয়াল্লিশের জন আন্দোলনের আভাস দিয়াছেন এবং পরবর্তী তিনটি অঙ্কে মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ রূঢ় বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মন্বন্তরের দ্বিবিধ কারণের মধ্যে একটি হইল প্রাকৃতিক এবং অপরটি মনুষ্যঘটিত। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে নাট্যকার আর একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল বন্যা। কিন্তু মনুষ্যঘটিত কারণই প্রধান। এক অবাঞ্ছিত ও এ-দেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন যুদ্ধের দায়ভার বহন করিতে হইল ভারতবাসীকে। খাদ্য, কাঁচা মাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিতে হইল ভারতকেই। ভারতে আগত বিপুল সংখ্যক বিদেশী সৈনিকদের জন্য খাদ্য মজুত রাখিতে হইল, খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক সমাজ হইল বঞ্চিত। জনবিরোধী সরকারের সঙ্গে যুক্ত হইল লোভী, কুচক্রী দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ কিছু অমানুষ শ্রেণীর মানুষ—জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোররূপে যারা

১। 'নবান্ন' নাট্যাভিনয়ের উপদেষ্টা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে এক সূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয় এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।'

Scanned with CamScanner

চিহ্নিত। রাতারাতি চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উধাও হইয়া গেল। নিম্নবিত্ত ও সঞ্চয় সম্বলহীন কৃষক সমাজ মহা সর্বনাশের মুখে পতিত হইল। তাহাদের ঘর গিয়াছে, ক্ষেতে শস্য নাই, মজুত শস্য লুণ্ঠিত—আমিনপুরের মত গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানভূমিতে পরিণত। গ্রামের মাটি হইতে দলের পর দল কৃষক আসিল শহরের নির্দয় পাষাণপথে। সেখান হইতে রিক্ত, বুভুক্ষু মানুষের কাতর কণ্ঠ শোনা যায়—'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও—রসনারোচক খাদ্য নয়, ভাত নয়, শুধু ফ্যান।'[১] আলোকোজ্জ্বল, উৎসবমুখর পাষাণপুরীতে কোনো সাড়া জাগে না। একদিন এই করুণ কাতর কণ্ঠস্বরও থামিয়া যায়। খোলা রাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে হাজার হাজার কৃষক ভিক্ষুক। তখনো কিন্তু সুখী ও সচ্ছল শহরবাসীর ঘরে ঘরে চলে আলো হাসি গান, সংবাদপত্রে মুখরোচক খবর ও দৃষ্টিনন্দন ছবি ছাপা হয়। এই হইল মন্বন্তরের চিত্র। স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য নাটকের ভূমিকায় এই চিত্রই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 'নেমে এল সারাদেশব্যাপী মহামন্বন্তরের করাল কালো ছায়া। কুলোর বাতাস দিয়া আগে আগে চললেন ধূমাবতী আর তার পশ্চাতে নিরন্ন মানুষেরা বিরামহীন ভূখামিছিল শ্মশানের হাহাকার তুলে শহরের অলিগলি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল। প্রাণের অপচয়ের সেই নিষ্করুণ ইতিবৃত্তান্ত সমগ্র জাতির জীবনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়।'

মন্বন্তরের এই কাহিনী নাট্যকার তাঁহার নাটকে কতখানি শিল্পসার্থক রূপ দিয়াছেন নাট্যগঠনরীতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহা আমরা দেখাইব। নাটকটি চার অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে আবার কয়েকটি দৃশ্য রহিয়াছে। প্রতিটি দৃশ্যের গোড়ায় নাট্যকার বিস্তারিত মঞ্চনির্দেশ দিয়াছেন। এই মঞ্চনির্দেশের মধ্যে নাট্যকার প্রয়োগের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। দৃশ্য পরিবেশ, চরিত্রগুলির ক্রিয়া ও আচরণ, আলো, শব্দ ও সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কে নাট্যকার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়াছেন। নাট্যকার স্বয়ং যে নাট্যপ্রয়োগকর্তাও বটে তাহা এই মঞ্চসচেতনতা হইতে বোঝা যায়।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি মূল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি প্রাক্‌পটভূমি রূপেই যেন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের অভয়া সংগ্রামীনারী মাতঙ্গিনী হাজরার আভাস পাওয়া গেল পঞ্চাননীর মধ্যে যে 'এগিয়ে যা, এগিয়ে যা' বলিতে বলিতে গুলির সম্মুখে প্রাণ দিল। রক্তরাঙা আগুনের আলোয় ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টির মধ্যে একের পর এক বিপ্লবীর দল মরণপণ সংগ্রামে আগাইয়া চলিয়াছে—এই দৃশ্যের মধ্যে যে তীব্র উত্তেজনা ও প্রচণ্ড গতিবেগের সৃষ্টি হইয়াছে নাটকের আর কোনো দৃশ্যেই তা দেখা যায় নাই। এই দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দারকে যথার্থ নির্ভীক সংগ্রামী নায়ক রূপেই আমরা দেখিলাম, তাহার মুখে প্রাণ দিবার অটল সঙ্কল্প—'ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব। প্রাণ দেব, প্রাণ দেব।' কিন্তু '৪২-এর সংগ্রামী নায়ক, এক বছর পরে মন্বন্তরে বুভুক্ষু, নির্যাতিত কৃষক সমাজের নায়ক হইয়া উঠিতে পারে নাই। মূল কাহিনীতে তাহাকে

১। গঙ্গাপদ বসু 'নবান্নের স্মৃতি' প্রবন্ধে মন্বন্তরের একটি বাস্তব চিত্র দিয়াছেন, 'সুরাবর্দী ইস্পাহানীর দল তখন গদিতে। তারা দেশে ধান চালের একটা ভয়াবহ অভাব সৃষ্টি করলো—তাদের ইঙ্গিতে মুনাফাখোর, মজুতদারেরা মারণযজ্ঞে মেতে উঠল। হাহাকার উঠলো সারা বাংলায় ঃ ধান নেই, চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই, কাপড় নেই। মানুষের সৃষ্টি এক মহামন্বন্তরে সারা বাংলা ডুকরে কেঁদে উঠল। জোয়ান চাষীর কঙ্কালসার কাঠামোটা হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কলকাতার ফুটপাথে, পথে পথে মৃতদেহের স্তূপ, দোরে দোরে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও চীৎকার।'

Scanned with CamScanner

নিষ্প্রভ, নির্বাপিত, নীরব দুঃখভোগী চরিত্ররূপেই দেখিতে পাই। বরং কুঞ্জকে আমরা পরে প্রথম দৃশ্যের বিপরীতধর্মী চরিত্ররূপেই দেখিতে পাই—নির্ভীক, রূঢ়ভাষী, প্রতিরোধী নায়ক। এ-নাটকে সংঘর্ষ ও আগুন প্রথম দৃশ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে, মূল কাহিনীতে 'নীলদর্পণে'র ন্যায় একটানা দুঃখভোগের অশ্রুপ্লাবিত ঘটনার ধারা। প্রথম দৃশ্য একটি স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ যেন একাঙ্ক নাটক। দ্বিতীয় দৃশ্যের কাহিনী এক বছর পরে শুরু হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যের চরিত্রগুলি আছে বটে, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন পটভূমিতে এবং পরিবর্তিত চেহারায়। মূল নাটক শুরু হইয়াছে এই দ্বিতীয় দৃশ্য হইতেই।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত আমরা প্রধান সমাদ্দারের পারিবারিক জীবনচিত্র দেখিলাম। আত্মনির্ভরহীন, বিপর্যস্ত প্রধান কুঞ্জের উপরেই নির্ভরশীল। পরিবারকে স্নেহে ও শাসনে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে কোমলে ও কঠোরে গড়া কুঞ্জ। অজন্মা, বন্যা, মহামারী ও কৃষকশ্রেণীশত্রু জোতদার হারু দত্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সপরিবারে প্রধান গ্রাম ত্যাগ করে। নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাস্থল কলকাতা। প্রথম অঙ্কের ঘটনার মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা ও ক্রমিক বিবর্তন ধারা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন ঘটনার সমষ্টি রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘটনা তথ্যচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই দুই অঙ্কে গ্রামের কৃষকের শোচনীয় পথচারী ভিক্ষুকরূপ দেখিলাম। গ্রামে যতদিন তাহারা ছিল ততদিন তাহাদের মধ্যে স্নেহমমতা, বিবেক, মনুষ্যত্ব বজায় ছিল, কিন্তু শহরে আসিবার পর এ-সব সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহারা জৈব ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যলুব্ধ, হিংস্র স্বার্থপরায়ণ অপ্রকৃতিস্থ জীব। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষক শ্রেণীর শত্রু জোতদার ও মজুতদার, চোরাকারবারী মহাজনের পারস্পরিক মিতালী এবং সমাজবিরোধী কাজকর্মে উভয়ের সহযোগিতা দেখা গেল। হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া পরস্পরের পরিপূরক। হারুদত্ত জোর করিয়া জমি দখল করিয়া শস্য পাঠায় কালীধনের গুদামে। অসহায় দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়া মেয়ে পাচার করে কালীধনের সেবাশ্রমে। আকারে, ইঙ্গিতে, কুঞ্চিত কটাক্ষে এবং অর্থপূর্ণ হাসিতে তাহারা নারীর দেহ কারবারে পরস্পরের সহযোগী তাহাও বুঝা গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের লীলা খেলা দ্বিতীয় অঙ্কেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থিত জনগণের শাস্তি দেখান হয় নাই, যে-ধরনের পরিণতি শ্রেণী-সচেতন নাটকে দেখান হইয়া থাকে। তাহারা গ্রেপ্তার হইল পুলিশের হাতে এবং তাহাদের আকার ইঙ্গিতে পুলিশের সঙ্গে যোগ সাজসের আভাস পাওয়া গেলেও রঙ্গাস্থলে তাহাদের আর আবির্ভাব ঘটে নাই। শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম ও জয় উত্থানপতনের মধ্য দিয়া একটা চূড়ান্ত উত্তেজনাপূর্ণ ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় নাই। হারু দত্ত ও কালীধন গ্রেপ্তার হইবার পরেই নাটকে কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার উপাদান লুপ্ত হইয়াছে এবং নাটকের কাহিনী একমুখীন, নিরুত্তাপ ও শিথিলগতি হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকের মধ্যে এই দুইটি অঙ্কে পরিস্থিতি রচনা ও ঘটনাধারায় নানা প্রকার অসঙ্গতি, অবিশ্বাস্য আকস্মিকতা ও অকারণ অসংলগ্নতা দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ফটোগ্রাফারদের কথা ও ক্রিয়ার আতিশয্য সাংবাদিকদের লঘুতা ও রোমাঞ্চকর উপাদানসংগ্রহের প্রবণতা নিয়া স্বয়ং সাংবাদিক নাট্যকার মৃদু শ্লেষের আঘাত

Scanned with CamScanner

দিয়াছেন বটে, কিন্তু একটা গোটা দীর্ঘ দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক-ভিখারীদের ডাস্টবিন হইতে উচ্ছিষ্টকণা খুঁটিয়া খাওয়ার দৃশ্য রূঢ় বাস্তবের কঠোর আঘাতে আমাদের চিত্ত নিঃসাড় করিয়া ফেলে, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেও ভিখারী বৃত্তান্ত, এটিও চিত্রধর্মী দৃশ্য, নাট্যধর্মী নহে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেও একটি অকারণ বিচ্ছিন্ন চিত্র মনে হয়। এই দুই অঙ্কে পরিস্থিতি রচনায় অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান, কুঞ্জ ও রাধিকা বাজার খোলায় খিচুড়ি খাওয়ার জন্য বিনোদিনীকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। এটা আশ্চর্য মনে হয়। মন্বন্তরের জন্যই কি মানুষের মনুষ্যত্ব এভাবে লুপ্ত! বিনোদিনী এক টাউটের পাল্লায় পড়িয়া কি সঙ্কটের সম্মুখীন হইল নাটকে তাহার উল্লেখ নাই, হঠাৎ সেবাশ্রমের কক্ষে তাহার সঙ্গে নিরঞ্জনের দেখা হইয়া গেল। এ-সব ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই। নিরঞ্জনের মত অভিমানী আত্মসচেতন চরিত্র কালীধন ধাড়ার মত অসৎ, চোরাকারবারী মহাজনের গুদামে তাহার বেআইনী সমাজবিরোধী কাজকর্মের সহায়তা করিতেছে ইহাও অসঙ্গত ও বিসদৃশ মনে হয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ ও রাধিকা হঠাৎ গ্রামের দিকে রওনা হইল, অশক্ত, অপ্রকৃতিস্থ জ্যাঠা প্রধানকে ফেলিয়াই রওনা হইল, প্রধান কিন্তু গেল না। কেন? কৃষকসমাজের যে প্রধান তাহাকে বাদ দিয়াই পরবর্তী অঙ্কে নবান্ন-উৎসব শুরু হইল। কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, ইহাই বোধ হয় সংসারের নিয়ম।

চতুর্থ অঙ্কে নবান্ন-উৎসব। এই উৎসব অনুযায়ী নাটকের নামকরণ হইয়াছে 'নবান্ন'। চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা, বক্তব্য বস্তু ও রসের আবেদন সবই মূল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিপরীতধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। নবান্নের পূর্ববর্তী 'জবানবন্দী' নাটিকায় মুমূর্ষু পরাণ মণ্ডল অন্তিম অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল, 'আমার সেই মরচে পড়া লাঙ্গাল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধর গে মাটিতে।' পরাণ মণ্ডলের সেই অন্তিম অভিলাষই যেন 'নবান্ন' নাটকে পূর্ণ হইয়াছে। কৃষকরা লাঙ্গাল চালাইয়াছে। শস্য উৎপাদন করিয়াছে এবং সেই শস্য উৎপাদনের উৎসব নবান্ন আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালন করিয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক কিভাবে রচিত হইল তাহা গঙ্গাপদ বসু 'নবান্নের স্মৃতি' প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেশে গিয়া কৃষকদের গাঁতায় খাটার দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে শুনিয়া এই গাঁতায় খাটার ব্যবস্থার কথা নাট্যকার দয়ালের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।[১] চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিয়াছে প্রত্যেক জমিতে গাঁতায় খাটিয়া তাহারা সকল জমির ফসল তুলিতে পারিবে, কোন জমির ফসলও নষ্ট হইবে না। দ্বিতীয় দৃশ্যে সকলেই ফসলের একভাগ ধর্মগোলায় কিভাবে জমা রাখিবে তাহাই দেখান হইয়াছে। এইভাবে সকলের দেওয়া ধানে ধর্মগোলা ভর্তি থাকিলে ভবিষ্যতে মন্বন্তর আর

১। বিজন ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার গ্রামের কৃষকরা যে অভিনব পন্থা বাহির করিয়াছে তাহা গঙ্গাপদ বসু এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 'সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের ধান কেটে ঘরে তুলে দেবে—এই পুরোনো গাঁতায় খাটা ব্যবস্থাটা ওরা আবার চালু করেছে। এই নিয়ে উৎসবের আয়োজনও হচ্ছে।

ব্যাস্। বিজন পেয়ে গেল বোধ হয় নাটকের শেষটার হদিস। লেখা হল নবান্ন নাটকের বিখ্যাত গাঁতায় খাটার মিটিং-এর দৃশ্য এবং তার পরেই শেষ দৃশ্য নবান্ন উৎসবের।'

—নাটক ও নাট্য-আন্দালন।

Scanned with CamScanner

কৃষককুলের ক্ষতি করিতে পারিবে না। তৃতীয় দৃশ্যে নিশ্চিন্ত কৃষকরা নবান্ন উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। শস্য উৎপাদন, বণ্টন ও রক্ষণ সম্পর্কে কৃষকদের সম্মিলিত প্রয়াস, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঅধিকারবোধ চতুর্থ অঙ্কে দেখান হইয়াছে। কৃষক সমাজের যে ঐক্যবোধ সঙ্কটে দেখা যায় নাই সম্পদকালে তাহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে লোকউৎসবের একটি চমৎকার চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজন ভট্টাচার্য বাংলার মাটি ও তাহার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও গভীর অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা হইতে গোরুদৌড়, মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা, ছড়া ও পাঁচালী গান ইত্যাদি দ্বারা লোকউৎসব প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কের স্বতন্ত্র মূল্য ও আবেদন নিয়া আলোচনা করা হইল। এখন প্রশ্ন ইহাই যে, এই চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনাধারার অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে কিনা এবং এই চতুর্থ অঙ্কে নাটকের কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি ঘটিয়াছে কিনা। নিছক কাহিনী নূতন নূতন ঘটনার স্তরের মধ্য দিয়া পূর্ব সম্পর্কহীন একটি আগন্তুক ঘটনায় পরিণতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু নাট্যকাহিনীর প্রত্যেকটি ঘটনা মূল ঘটনাধারার সঙ্গে যুক্ত এবং যে সমস্যা নিয়া নাটকের আরম্ভ হইয়াছে তাহারই পরিণতি নাটকের শেষে দেখাইতে হইবে। কাহিনীর আদি মধ্য ও অন্ত্য অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ দেখাইতে হইবে। মন্বন্তরে যে কাহিনীর আরম্ভ মন্বন্তরের বিষাদময় পরিণতিতেই সেই নাটকের শেষ দেখাইতে হইবে, মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের জন্য বেদনা ও সহানুভূতি এবং মন্বন্তর যাহারা ঘটায় তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদ জাগানর মধ্যেই ছিল নাটকের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। এ-ধরনের পরিণতি জবানবন্দী নাটিকায় ছিল। কিন্তু নাট্যকার পরাজয়ে, বিষাদে, হতাশায় নাটকের পরিণতি দেখাইতে চাহেন নাই, তিনি কৃষক সমাজের আত্মপ্রত্যয়ী অভ্যুত্থানে, উজ্জীবিত আশায় এবং উদ্দীপিত সংগঠনে নাটকের পরিণতি দেখাইয়াছেন। এই পরিণতি অতিশয় কাম্য কিন্তু কতখানি অনিবার্য ও শিল্পসম্মত তাহাই বিচার্য।

বন্যায় গৃহহীন এবং মন্বন্তরে অন্নহীন হইয়া প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের সকলে কলিকাতায় গিয়া ভিক্ষা শুরু করিল। কিন্তু একে একে তাহারা ঘরে ফিরিল। দেখা গেল তাহারা কৌতুকে হাসিতে আনন্দে মাতিয়া রাশি রাশি সোনার ধান ঘরে তুলিতেছে। শ্মশানভূমি কিভাবে সুজলা সুফলা শস্যভূমিতে পরিণত হইল তাহা জানা যায় না। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সানন্দ শলা পরামর্শের মধ্যে ফকির একটা প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'আর তারপর ধান বন্ধকী রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই গা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর!' এই প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারে নাই। যে শস্যপ্রাচুর্য ও সম্পদ চতুর্থ অঙ্কে দেখা গিয়াছে তাহা কৃষকের স্বপ্নে প্রত্যাশিত কিন্তু মন্বন্তরের পরেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তাহা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ সে-সন্দেহ কিন্তু থাকিয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কের উৎসবমত্ততার মধ্যে মন্বন্তরের বিভীষিকা, মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট, শ্মশানের হাহাকার, জোতদার, মহাজনদের নির্মম রক্তশোষণ সব কিছুর স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা আমাদের নিশ্চিন্ত শান্তি ও লঘু আনন্দ মত্ততায় মাতাইয়া রাখে। যে অন্তহীন জ্বালা ও দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে প্রতিরোধের সঙ্কল্প ও সংগ্রামের শপথ জাগিয়া উঠে তাহার কোন অস্তিত্ব অন্তিম অঙ্কে না থাকার জন্য সংগ্রামী নাটক রূপে 'নবান্ন' সার্থক হইয়া উঠে নাই। জোতদার ও মহাজনের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এবং সেই সংঘর্ষে কৃষকশ্রেণী অনেক কিছু হারাইয়া যদি জয় লাভ করিতে পারিত তবেই এই অন্তিম আনন্দ উৎসব স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণাম মনে করা যাইত।

আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশে নাটকের কেন শেষ হইল তাহার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী কোন নাট্যকারই তাঁহার নাটকের পরিণাম দেখাইতে পারেন না পরাজয়ে, বিষাদে, মৃত্যুতে। নাটকের পরিণাম তাঁহাকে দেখাইতে হয় সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তির অভ্যুত্থানে, জয়ে, আনন্দে। শিল্পের দাবী, রসের দাবী বড় নহে, বড় এখানে মতবাদ নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বের দাবী। মন্বন্তর এখানে শেষ কথা নহে, শেষ কথা হইল মন্বন্তর হইতে উত্তরণ—নবান্ন উৎসব। যাহা কাম্য তাহাই দেখান হইয়াছে, যাহা শিল্পরীতির দিক দিয়া অনিবার্য তাহা দেখান হয় নাই।

নবান্ন নাটকের চরিত্রাঙ্কনের মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রথম দৃশ্যের বিদ্রোহী নায়ক প্রধান সমাদ্দার মূল কাহিনীতে দুর্বল, আত্মপ্রত্যয়হীন, নির্বিরোধ এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে, প্রধানের প্রাধান্য কোথাও দেখা যায় নাই। কৃষক সমাজের সংগঠনে তাঁহার কোন ভূমিকাই নাই। প্রথম অঙ্কে দৃঢ়চেতা, রূঢ়ভাষী, প্রতিরোধী কুঞ্জ চরিত্রই পরিবারকে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় কুঞ্জও বৈশিষ্ট্যহীন ভিখারী চরিত্রে পরিণত, গ্রামে ফিরিয়া আসার পর সে কৃষক সমাজ সংগঠনে সহযোগী বটে, কিন্তু তাহার প্রতাপ ও প্রাধান্য কিছুই নাই।

'নবান্ন' নাটকের বৃত্তগঠনরীতি ও চরিত্রাঙ্কনে অনেক ত্রুটি ও অসঙ্গতি আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখান হইল। তথাপি নাটক ও আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক গণনাট্যের প্রবর্তনা, নাটকে শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত শ্রেণীসচেতন নাটকের উপস্থাপনরীতি এই নাটক হইতেই দেখা গেল। সেজন্য ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অনেকখানি।

Scanned with CamScanner